ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 715-724
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.061

বাংলা সাহিত্যে দলিত ও শরৎচন্দ্র

কিরণ মন্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ভারত*

Received: 12.01.2025; Accepted: 20.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The word 'Dalit' in a Hindi word, but word has been used in Bengali Language long before. The word 'Dalit' becomes a uniform force which express a broder caste community. We can explain that the Dalits are the sufferers. The word 'Dalit' is related to various remarkable words such as lower cast, lower community, the sufferers, the outsider, the terminal etc. SaratChandra expresses them in his writings so that the so called readers of our society can understand about them. But he could not describe how to emancipate them from the sufferings. He gives this duty to his readers. If he did not write about them they were under water of sufferings and unbringings and mishaps of our society. So the Dalits are described as Dalits in his writings which is expressed in Bengali Literature.

Key words: Dalit, Uniform, Express, Community, Sufferers, Outsider, Emancipate, Unbringings.

মানুষ সামাজিক জীব একথা আমরা সবাই জানি। এই সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল জীবন ধারণের প্রয়োজনে। মানুষ প্রথমে দল বেঁধে থাকার সুবিধা বুঝে একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকে, তা থেকেই ধীরে ধীরে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় থেকে বর্ণ-বর্গ-গোত্র ইত্যাদি গড়ে ওঠে। প্রাচীনকাল থেকেই দলিত মানুষের অস্তিত্ব ছিল বলে দেখা গেছে। যারা বঞ্চনার ফলে পিছিয়ে পড়েছে সমাজ জীবন থেকে কিন্তু শোষণ ও নিপীড়নের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সেই পিছিয়ে পড়া থেকে আজও এদের মুক্তি ঘটেনি। কালক্রমে তারাই দলিত নামে পরিচিত হয়েছে। হিন্দি ভাষার সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা অনুশোচিত জনজাতি তারাই এস.সি, এস.টি, এবং ও.বি.সি নামে পরিচিত হয়েছে।

'দলিত' শব্দটি হিন্দি ভাষার শব্দ কিন্তু এই শব্দটি বহুদিন আগে থেকেই ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ভারতে বিশেষ কোনো বর্গের নাম হিসাবে শব্দটি নতুন বলে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন এক পারিভাষিক শব্দ। 'দলিত' শব্দটি হয়ে উঠেছে স্বয়ংক্রিয় এক শক্তি যা একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্টতা দেয়। অচিন্ত্য বিশ্বাস এর মতে- "বলপূর্বক অবদমনের ফলে যে বর্গের মানুষরা মানবিক অধিকার বঞ্চিত তারাই দলিত।"[১] অর্থাৎ 'দলিত' বলতে আমরা নিপীড়িত মানুষদের বুঝি।

'দলিত' শব্দটি বিশেষণ, যার আভিধানিক অর্থ মর্দিত, মাড়ানো হয়েছে এমন অর্থাৎ পদদলিত, পিষ্ট, দমিত এবং নিপীড়িত প্রভৃতি। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে মুসলমানরা ছাড়াও যেসব সামাজিক গোষ্ঠী কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদের অনেকটাই সরিয়ে রেখেছিল, তারা হলো অব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য। ১৯৩০ এর দশক থেকে অস্পৃশ্যরা নিজেদের দলিত অর্থাৎ নিপীড়িত দলিতবর্গ বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক শব্দ 'পিছড়েবর্গ' বা পশ্চাৎপদ শ্রেণির চেয়ে 'দলিত' শব্দটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে বোঝানোর জন্য সুপ্রযুক্ত এবং তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। অন্যদিকে গান্ধীজীর দেওয়া 'হরিজন' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের সন্তান' নামটিও আপত্তিকর ছিল, কেননা এর মধ্যে কৃপা ও করুণার পাশাপাশি বর্ণাশ্রম দর্শনের প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব রয়েছে। 'দলিত' শব্দটির মধ্যে 'দলন' প্রক্রিয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। অধ্যাপক হিরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- "...'দলন' বস্তুটি আমাদের দেশে এবং সমাজে আবহমান কাল থেকে প্রায় একটি 'fine arts' এ পরিণত হয়েছে। যার তুলনা জগতে শুধু দুর্লভ নয়, একেবারে অপ্রাপ্য। মুনি-ঋষিদের দোহাই দিয়ে আর নিত্যকর্ম পদ্ধতিকে ধর্মের শিকলে বেঁধে রেখে, শুধু বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ আর জন্মান্তরবাদের মতো ধারণার জোরে ইতিহাসে সর্বকালের সর্বদেশের সবচেয়ে মজবুত 'শ্রেণীকর্তৃত্বে'এর ইমারত এদেশের মনুবাদীরা পরম ঐতিহাসিক দক্ষতায় প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।"[২] বাসব সরকারের মতে- "সমাজের নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনায় উদাসীন কিন্তু স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে সজাগ সংগঠিত জঙ্গি অংশের নাম 'দলিত'।"[৩]

আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে 'রাশিয়ার চিঠিতে' লিখেছেন- "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদের সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পত্তির উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পড়ে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে। সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে। উপোসে মরে। উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে। জীবন যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ-সুবিধে সবকিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে- উপরের সবাই আলো পায় আর তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"[৪] অর্থাৎ এই যে মাথায় প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের শরীরে তেল গড়িয়ে পড়ে তবুও সকলকে আলো দান করে যে মানুষগুলি, তাদেরকেই আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দলিত' বলে অভিহিত করেছেন।

১৯৩১ সালে ড. বি. আর. আম্বেদকর আমেদাবাদ ভ্রমণের সময় 'দলিত' সম্প্রদায়ের প্রতি বলেন- "my dalit friends, think for a while and ask yourself a question. Does this country belong to you? And freedom for whome?"[৫] অর্থাৎ আমার দলিত বন্ধুগণ, ক্ষণিকের জন্য ভেবে নিজেদের মধ্যে একটি প্রশ্ন করো। এই দেশটি কি প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য? এবং স্বাধীনতা কাদের জন্য?

বর্ণের দিক থেকে নিচু মানুষদের 'দলিত' ও বলা হয়ে থাকে। 'দলিত' শব্দটি নতুন নয়, মারাঠি, হিন্দি, গুজরাটি এবং আরো অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় দরিদ্র ও শোষিত জনগণ অর্থে তা প্রচলিত রয়েছে। ১৯৩০ সালে হিন্দি ও মারাঠা অনুবাদে 'বঞ্চিত শ্রেণি' বা 'Depressed class' অর্থে 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সংকীর্ণ অর্থে 'দলিত' বলতে হিন্দু জাতিভেদ ও বর্ণভেদ যুক্ত সমাজের অস্পৃশ্য অংশকে বোঝায়। 'দলিত' কথাটি উচ্চারণের সাথে সাথে আমাদের মনে নিম্নবর্গ, নিম্নবর্ণ, অন্ত্যজ, ব্রাত্য, প্রান্তিক, নিম্নবিত্ত ও

নিম্নশ্রেণি ইত্যাদি কথাগুলি উঠে আসে। অনেক সময় আমরা শব্দগুলিকে একই অর্থের বলে ভুল করে থাকি, তাই এখন আমরা প্রতিটি বিষয়কে একটু আলাদা আলাদা ভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি-

'নিম্নবর্গ' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'সাবলটার্ন' (subaltern)। এই 'সাবলটার্ন' শব্দটি বিশেষভাবে সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ অধস্তন বা নিম্নস্থিত। ইতালিও দার্শনিক ও কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামশি ১৯৩০ এর দশকে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কারাগারের নোটবই' (prison notebooks) বইতে 'সাবলটার্ন' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তখন থেকেই শব্দটির বহুমুখী ব্যবহার ছিল। নিম্নবর্গের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রনজিৎ গুহ তার 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' প্রবন্ধে বলেছেন- "ঔপনিবেশিক যুগে ভূস্বামীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, গ্রাম ভদ্রদের মধ্যে যারা আর্থিক বা সামাজিক ক্ষমতায় একটু খাটো, মাঝারি কৃষকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ওপরের দিকে এবং ধনী কৃষক শ্রেণি এরা সকলেই আমার সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে নিম্নবর্গের অন্তর্গত। ...উচ্চ বর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভু শক্তির অধিকারী ছিল। ...ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ।"[৬]

নিম্নবর্গ সম্পর্কে রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- "হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যারা সর্বনিম্নে অবস্থিত তারাই তমঃ গুণান্বিত। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এদের সবার নিচে শূদ্র। এরাই তমঃ গুণের আধার, পেশাগত দিক থেকে হীনকর্মে ব্রতী, জাতিগত দিক থেকে অচ্ছুৎ, অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে দরিদ্র, শিক্ষাগত দিক থেকে নিরক্ষর, সংস্কৃতি চিন্তায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই সকল পরিচয়ে পরিচিত মানুষ, কালে কালে বিভিন্ন ধরনের প্রভুশক্তির পীড়নে পর্য্যুদস্ত। এই দলিত, অচ্ছুৎ, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত।"[৭]

এবার আসা যাক 'নিম্নবর্ণ' (lower cast) বলতে বোঝায় প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে যে চারটি বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মানুষ দেখা যায়। বর্ণগত দিক দিয়ে শূদ্ররাই সবচেয়ে বেশি শোষিত হতে দেখা যায়, তাই এই শুদ্রদেরকেই নিম্নবর্ণের মানুষ বলা হয়ে থাকে। 'অন্ত্যজ' বলতে সমাজের নিম্নস্তরের অস্পৃশ্য, অবজ্ঞাত মূলত দরিদ্র সবার পিছে সবার নিচে সর্বহারাদেরই বুঝেছি। তবুও মনে রাখতে হয়েছে 'অন্ত্যজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ও পরবর্তী সময়ে তার সংকীর্ণ অর্থ ব্যঞ্জনা। আক্ষরিকভাবে অন্ত্য=অন্ত+জ, জন্মা (যে জন্মে)= অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বিরাট পুরুষের (ঋগ্বেদ) দেহ থেকে জন্মের পর শেষ জাত চতুর্থ বর্ণ শূদ্রই হল অন্ত্যজ। এই অর্থে 'শূদ্র' অর্থে কিন্তু কোন ঘৃণার কথা নেই কারণ পবিত্র বিরাট পুরুষের সকল অঙ্গই তো পবিত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্ত্য (শূদ্র) থেকে জ (জাত) অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিলোমজ সন্তানদের বলা হতে লাগলো অন্ত্যজ। এখন থেকে 'অন্ত্যজ' শব্দের প্রতি সমাজের অন্য তিন বর্ণের অবজ্ঞা লক্ষ্য করা গেল। স্মৃতি শাস্ত্রে বিধান দেওয়া হল যে শাস্ত্রসম্মত সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহের পর সামাজিক প্রথা লঙ্ঘনের ফলে ভ্রষ্ট সংস্রবের সন্তানরাই 'অন্ত্যজ'। আবার 'অন্ত্য' অর্থ নীচ, তাই নীচকুলে যার জন্ম সেই নীচাশয়, অধম ব্যক্তিই অন্ত্যজ।"[৮]

'ব্রাত্য' বলতে ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'ব্রত+ষ্ণ্য' (হীনার্থে) হল 'ব্রাত্য' (সরল বাংলা অভিধান: সুবল মিত্র)। কিন্তু অন্য জায়গায় দেখি 'ব্রাত (ব্যাধাদি) + য' সাদৃশ্যে হল 'ব্রাত্য' কিংবা 'ব্রাত+ত্য' (বেদব্রতচ্যুত অর্থে) হল 'ব্রাত্য' (বঙ্গীয় শব্দকোষ: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। অর্থ : ব্রতভ্রষ্ট, আচার-সংস্কারহীন, বর্ণচ্যুত, পতিত। অর্থাৎ নিন্দিত অর্থে, হীনার্থে, সংকুচিত ছোট অর্থে, নীচ অর্থে 'ব্রাত্য' শব্দটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। ড. সুকুমার সেনের মতে, “প্রাচীন বৈদিক ধারার আর্যভাষীরা সমাজ রীতির দিক দিয়ে দুই দলে বিভক্ত ছিল- ‘গ্রাম্য’ আর ‘ব্রাত্য’। ‘গ্রাম্য’ ছিল মর্যাদাবান কুলপতি। দ্বিতীয় দল, যাদের মর্যাদা গ্রাম্যদের তুলনায় অনেক কম ছিল, তাদের নাম ছিল ‘ব্রাত্য’। পরবর্তীকালে শব্দটির আসল অর্থ লোপ পাওয়ার নিন্দার্থক অর্থ আসিয়া যায় এবং তাহা হইতে ‘ব্রতবাহ্য’ অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতিচ্যুত এই মানে দাঁড়াইয়া যায়।”[৯] ‘ব্রাত্য’ বলতে স্যার উইলিয়াম মনিয়রের মতে, “vratya a man of the medicant or a vagrant class, a tramp, out caste, low or vile person, either a man who has lost caste through non-observance of the ten principal sanaskaras or a man of low caste descended from a sudra and a kshatriya, accord to some of the illegimate son’s of a kshatriya who know the habits and intentions of slodiers.”[১০]

এবার আরও একটি শব্দ এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসে তা হল ‘প্রান্তিক’। ‘প্রান্তিক’ বলতে সাধারণত প্রান্তে বা সীমান্তে যার অবস্থান তাকেই বোঝায়। অর্থাৎ ‘Hegemony’ তথা ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা আধিপত্যকে কেন্দ্র করে যদি একটি বৃত্ত আঁকি তাহলে সেই বৃত্তের প্রান্তে বা পরিধিতে যারা থাকে তাদেরকেই ‘প্রান্তিক’ বলা হয়। তাই পদাবলী সাহিত্যের সাথে সুর মিলিয়ে বলা যায়, সব নিম্নবর্গই প্রান্তিক কিন্তু সব প্রান্তিকই নিম্নবর্গ নয়। অর্থাৎ ‘প্রান্তিক’ বা ‘প্রান্তজন’ বলতে আমরা মূলত সমাজের প্রান্তে অবস্থিত পিছিয়ে পড়া, মূল সভ্যতা থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষদেরকেই বুঝি। যারা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে শুধু দুমুঠো অন্নের জন্য। যাদের বুদ্ধির তুলনায় দৈহিক ক্ষমতা অনেক বেশি।

এছাড়া আরও দুটি শব্দ ‘নিম্নবিত্ত’ ও ‘নিম্নশ্রেণি’ নিয়ে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। সাধারণত বিত্ত কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ইংরেজি ‘Finance’ শব্দটির বাংলা অর্থ হল ‘বিত্ত’। তবে বিত্ত নির্ভর করে অনেকটাই মানুষের কর্মের উপর তাই বিত্তের সঙ্গে বংশ-পরম্পরার কোন সম্পর্ক নেই। তাই বিত্তের পরিমাণকে কেন্দ্র করে মূলত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় মূলত কৃষক, ভিখারি, দিনমজুর, শ্রমিক ইত্যাদি। এক কথায় দৈহিক শ্রম নির্ভর বা পেশীনির্ভর কর্মজীবীরা এর মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে ইংরেজি ‘Lower Class’ শব্দটির বাংলা অর্থ হল ‘নিম্নশ্রেণি’। মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী ‘নিম্নশ্রেণি’ বলতে আর্থিক অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেই সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডে নিচু তলার মানুষদেরও বোঝায়।

যুগের হিসাবে দেখা যায় নিম্নবর্গের মানদন্ড হিসাবে এক এক সময় এক এক জিনিসকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে মাপকাঠি ছিল বর্ণ, ঔপনিবেশিক যুগে মাপকাঠি ছিল শিক্ষা আর বর্তমানে উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে মাপকাঠি হয়েছে অর্থনীতি। কার্ল মার্কস শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে অর্থনীতিকেই দেখেছিলেন। জমিদারি, মহাজনি শাসনব্যবস্থায় গরিব চাষী, কৃষকদের যখন চরম দুর্দশা দেখা যায় তখন অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব দেখা দিল। কলকারখানার প্রসারের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। গ্রামের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ গুলি তখন কৃষিতে আধুনিকীকরণ না ঘটার ফলে শহরে এসে কলকারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীনকালে বর্ণগত অনগ্রসরতা এবং বর্তমানের অর্থগত অনগ্রসরতা প্রায় একই রকমের। জন্মগত দিক থেকে যারা দলিত বর্গের, তারাই অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষিত হয়ে এসেছে। দলিত বর্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল দারিদ্র। বর্ণগত, পেশাগত, গুণগত, শিক্ষা সংস্কৃতিগত উত্থান পতনের পর যা থাকে তা হলো

দারিদ্র। নিম্নবর্গের সমস্যা আগেও ছিল এখনও আছে এবং পরেও রয়ে যাবে। সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের বঞ্চনার শিকার হয়ে এসেছে এরা যুগ যুগ ধরে। এরাই নিম্নবর্গের-নিম্নবিত্তের-নিম্নবর্ণের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী এরা তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি হিসাবে পরিচয় লাভ করেছে। আবার ৯০ এর দশকে অন্যান্য অনগ্রসর জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হল-

১. **তপশীলি জাতি:** ডোম, বাগদি, দুলে, চন্ডাল, চামার, চর্মকার, মুচি, ধোপা, বাইতি, বাতার, বাউরী, ভোগতা, বিদ, চৌপাল, ধাঙড়, তাৎমা, দোসার, ধারী, খাসী, হাঁড়ি, মেথর, ভাঙ্গী, জেলে, মালো, কাদর, কামী(নেপালি), কাওড়া, কাউর, কোচ, কোনার, লোহার, মাহার, মাল্লা, নমঃশূদ্র, নাট, নুনিয়া, পালিয়া, পাটনী, পোদ, রাজবংশী, শুড়ী, তিয়র, তুরি, কোটাল প্রভৃতি সম্প্রদায়।

২. **তপশীলি উপজাতি:** ভুমিজ, বেদিয়া, বীরহোর, বিরজিয়া, চাকমা, চেরো, গারো, গোন্দ, গোড়াইত, হাজং, হোড়, খারওয়ার, খোন্দ, কোড়া, লেপচা, লোধা, খড়িয়া, লোহারা, মগ, মাহালী, মাল, পাহাড়ীয়া, মেচ, মুন্ডা, নাগেশিয়া, ওঁরাও, রাভা, সাঁওতাল, শবর, সব্বা, তামাং, ভুটিয়া, টোটো প্রভৃতি সম্প্রদায়।

৩. **অন্যান্য অনগ্রসর জাতি:** গোয়ালা, বেনে, বারুই, মোদক, তেলি, কৈবর্ত, দফাদার, ধুনিয়া, জমাদার, চিত্রকর, কাপালি, কর্মকার, মহলদার, যোগী, কুর্মি, ফকির, গায়েন, লস্কর, কুমার প্রভৃতি সম্প্রদায়।

এতক্ষণ আমরা 'দলিত' শব্দ নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসা যাক 'দলিত সাহিত্য' বলতে ঠিক কী বোঝায়? এ বিষয়ে মনোহরমৌলি বিশ্বাস বলেন- "দলিত সাহিত্য মানে গ্রাম সংস্কৃতিতে বিকল্প চেতনার উন্মেষ ঘটানো। নগর সভ্যতার সাথে দলিত মানুষের যোগ নেই বললেই চলে। যে-টুকুনি যোগ তা যে ক্ষীন রশিতে বাধা। যেহেতু তাদের জন্ম এবং অবস্থান গ্রামে, গ্রামই তাদের প্রেম ও ভালোবাসার তীর্থ। গ্রামের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-লাঞ্ছনা, ঘৃণা শোষণ তাঁদের লৈখিক শিল্পের আধার। অন্য লেখকদের থেকে তাঁদের চিন্তায় একটা বড় পার্থক্য ধরা পড়ে এইখানে যে, তারা দৈবনির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে চান। মানুষ ভাগ্যের হাতে বন্দী হতে চান তখনই, যখন নিজের ভেতরের শক্তিতে আর আস্থা থাকে না তাঁদের। জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ হিসাবে নায়ক-নায়িকাকে করে তুলতে হয় ঈশ্বরমুখী। দৈবের থেকে আহৃত শক্তিতে মিলে যায় জীবনের অমিল অংকের উত্তর। এই চিরকালীন সংস্কৃতি বোধে মানুষের নিজস্ব পরাজয় বিধৃত হয়। দলিত সাহিত্য মানুষের জয়ী হবারই স্বপ্ন দেখায় এবং সে স্বপ্ন বাঁচার। মানুষই সেখানে কথক ও কথকতা। যদিও লেখকদের একটি পা শহরে এবং একটি পা রয়েছে গ্রামে, শিকড়ের টানে শক্তি সঞ্চারিত হয় প্রতিটি লেখায়। দলিত সাহিত্য যেন আরও নির্দিষ্ট হতে পারল আত্মপরিচয়ে- যাঁরা দলিত, তাঁদের জন্য লেখা, তাঁদের নিয়ে লেখা, তাঁদের লেখাই দলিত সাহিত্য।"[১১]

সাহিত্যের মধ্যে 'দলিত' প্রসঙ্গ হঠাৎ করে এসে যায়নি, আমরা দেখি বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'এর মধ্য থেকেই এই 'দলিত ' প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে। সেখানে ডোম, শবর, চন্ডাল, জেলে, কুলি, মাঝি, ব্যাধ, ক্ষেতমজুর প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় দলিত জাতির প্রসঙ্গ রয়েছে। যাদেরকে নগরের বাইরে, উঁচু পর্বতে বসবাস করতে হত। তাদের বৃত্তি ছিল ঝুড়ি, চাঙাড়ি বোনা, নৌকা চালানো, মদ তোলা, শিকার করা প্রভৃতি। ফলে 'দলিত' মানুষের কথা যে এখানে রয়েছে সে কথা বলাই যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যেও একইভাবে নিম্নবর্গীয় দলিত প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও আমরা গোপ ও গোপিনীর প্রসঙ্গ

পাই, যারা মাঠে গরু চড়ায় ও বাজারে দুধ, দই বিক্রি করে। তাই এদেরকেও নিম্নবর্গীয় 'দলিত' বললেও মনে হয় ভুল হয় না। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে'ও আমরা নিষাদরাজ গুহক চন্ডাল কে পাই যাকেও আমরা এই পর্যায়ে ফেলতে পারি। 'মহাভারতে' আমরা একলব্য এর কথা পাই। 'চৈতন্য সাহিত্যে'ও যবন হরিদাস ও শ্রীধর এর প্রসঙ্গ পাই যাদেরকেও নিম্নবর্গীয় দলিত হিসাবে ধরা যেতে পারে। পরবর্তী ধারা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই দলিত প্রসঙ্গ নানাভাবে ধরা পড়েছে। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে আমরা রাখাল, জেলে জালু ও মালু, বিশাই ছুতোর, গোদা ঘাটোয়াল, শিবা ডোম প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে নিম্নবর্গীয় দলিত হিসাবে পাই। একইভাবে 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যেও কালকেতু-ফুল্লরা সেই দলিতবর্গ থেকেই উঠে এসেছে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও সাধারণত ডোম সমাজ, কালু ডোম ও লখাই ডোমনী এর প্রসঙ্গ উঠে আছে যারা প্রকৃত দলিত। 'শিবায়ন' কাব্যের শিবের কৃষক রূপ ও ভিক্ষাবৃত্তি করার প্রসঙ্গ পায়, এছাড়া বাগদী জাতি, কোচনী প্রভৃতি বর্গের সমাজের কথা আসে, যারা নিম্নবর্গীয় দলিত এর মধ্যে পড়ে। সেরকমই আমরা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও ঈশ্বরী পাটনী, শিবের ভিক্ষুকের বেশ, হরিহর প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিম্নবর্গীয় অতি দরিদ্র দলিত বলেই আলোচনা প্রসঙ্গে ছুঁয়ে গেছি।

মধ্যযুগের পরবর্তীতে আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যের ধারায় সার্থক রূপকার হিসাবে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে পাই। তার বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধের মধ্যেও আমরা নিম্নবর্গীয় দলিত প্রসঙ্গ পায়। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে মাশী লেঘরের ঘরে নিম্ন দলিতবর্গের এক শূদ্রের যুবতী কন্যাকে দাসী করতে দেখি। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নিম্নবর্গের মাঝি, মতিবিবির দাসী প্রভৃতি চরিত্রকে পায়। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে হেমচন্দ্রর ভৃত্য দিগ্বিজয় কে নৌকার মাঝি রুপে এবং রত্নময়ীর পিতাকে নিম্নবর্গীয় পাটনী চরিত্র হিসাবে পেয়েছি। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে আমরা হীরা চরিত্রটিকে দাসী রূপে এবং নদী তীরে রাখাল, কৃষক, কুলকামিনীর বর্ণনা পায় যা দলিত রূপে প্রতিভাত হয়। 'ইন্দিরা' উপন্যাসে কাহার জাতিকে পায় এবং জেলে চরিত্রের খোঁজ পায় যারা নিম্নবর্গীয় দলিত বর্গেরই মানুষ। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে মালী, দাসদাসী, পাঁচি চাঁড়ালিনি, পালকিবাহক প্রভৃতি নিম্নবর্গের দলিত মানুষের পরিচয় পায়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেও ভিখারি, তাঁতি, চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগদী প্রভৃতি জাতির পরিচয় মেলে যা দলিত বর্গের অন্তর্ভুক্ত। 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসেও আমরা প্রফুল্লকে বাগদী ঘরের মেয়ে হিসাবে এছাড়াও হাড়ি, ডোম, চন্ডাল, বেহারা, মাঝি, নাপিত প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় দলিত বর্গের মানুষের পরিচয় পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীতে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পায়। তাঁর 'করুণা' উপন্যাসের মধ্যে ভবি ও শম্ভুকে নিম্নবর্গের চরিত্র হিসাবে দেখা যায়। 'রাজর্ষী' উপন্যাসের মধ্যে আমরা নিম্নবর্গের দলিত হিসাবে আদিবাসী সমাজের কুকি ও জুমিয়ারা জনজাতির পরিচয় পায়। 'চোখের বালি' উপন্যাসে আমরা জেলে, মাঝি মাল্লা, লাছমনিয়া, প্রভৃতি চরিত্র কে নিম্নবর্গের মানুষ হিসাবে দেখেছি। 'গোরা' উপন্যাসের মধ্যেও আমরা জেলে, ছুতোর, নাপিত, ফেরিওয়ালা, চন্ডাল এবং চরঘোষপুরের ফরুসর্দার কে নিম্নবর্গের দলিত জাতি হিসেবে পরিচয় পেয়েছি। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে আমরা নিম্নবর্গের হতদরিদ্র দলিত বর্গের প্রতিভু হিসেবে পঞ্চু চরিত্রটিকে পেয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী সাহিত্যিক হিসাবে আমরা যাকে পেয়েছি তাকে নিয়েই আমাদের মূল আলোচনা, তিনি হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একদিকে যেমন বাংলার জমিদার শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নিখুঁত ও প্রাণবন্ত রূপ দিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে উপেক্ষিত, পতিত, অপাঙক্তেয়, অবহেলিত, নির্যাতিত শ্রেণির মানুষদের কথাও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের অশিক্ষা,

সংস্কার কুসংস্কার, আত্মিক ও মর্মান্তিক সমস্যাগুলিই তার সাহিত্যের কেন্দ্রবস্তু হয়ে পড়েছে। তিনি পল্লী বাংলার নিম্নবর্গের অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সারা জীবন ধরে সংস্পর্শে যেমন থেকেছেন তেমনি তাদেরকে সাহিত্যেও স্থান দিয়েছেন। তিনি সমাজের এই অবহেলিত, অবদমিত, নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, পীড়িত নিম্নবর্গের দলিত মানুষের হাত ধরে টেনে তুলেছেন তার লেখনীতে।

গোপাল চন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে দেখিয়েছেন- "তাঁর নিজের কথায়- 'এমন দিন গেছে, যখন দু তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়িতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে-তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ি-বাগদীর বাড়িতে আহার করেছি...তারপর খুব ভালো করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ'।"[১২] শরৎচন্দ্রের রচিত যে সমস্ত গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে আমরা নিম্নবর্গীয় দলিত বর্গের পরিচয় পেয়েছি সেগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করছি-

প্রথমেই আসা যাক গল্পের কথায়। 'বিলাসী' (১৯১৮) শরৎচন্দ্রের অন্যতম ছোট গল্প। এখানে ব্রাহ্মণ সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দলিত শ্রেণির বেদের মেয়ে বিলাসী দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের অসুখের সময় এই দলিত নারী বিলাসী নিরলস সেবা-শুশ্রুষার দ্বারা তাকে সারিয়ে তোলে এবং স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সেটি সমাজ মেনে নেয় না, ভদ্র সমাজের কাছে এটা অনাচার। বিলাসীর প্রেম গভীর, সে মৃত্যুঞ্জয় কে নিয়ে মালোপাড়ায় উঠলো। সুখেই চলছিল তাদের জীবন কিন্তু একদিন একটা বাড়িতে সাপ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা যায় মৃত্যুঞ্জয়। স্বামী বিয়োগের ব্যথা বিলাসীর বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানে। সে এক সপ্তাহের মধ্যে আত্মহত্যা করে প্রেমাস্পদহীন পৃথিবী থেকে বিদায় নিল- "একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে তো বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।"[১৩] সমাজ নেতারা এর মধ্যে পাপের অবশ্যম্ভাবি দন্ডবিধির নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে সমাজনীতির জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে। প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য এই প্রাণ বিসর্জন দলিত বর্গের প্রতিভু হিসেবে বিলাসী চরিত্রটিকে অনন্য করেছে।

'মহেশ' (১৯২২) গল্পেও দলিত মুসলমান কৃষক গফুর ও তার মেয়ে আমিনার কথা পাই। দলিত বলে আমিনাকে জল আনতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। জমিদার শিবচরন বাবুর অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে আমিনাকে নিয়ে ফুলবেড়ের চটকলের দিকে রওনা দেয়। যাওয়ার সময় বলে- "আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে, তার চরে খাবার এতোটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি তার কসুর তুমি যেন কখনো মাফ করো না।"[১৪] বর্ণবৈষম্য ও সমাজের শোষক ও শোষিত দুই শ্রেণির চিত্র ফুটে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে দলিত শ্রেণিকে যে কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তা দেখিয়েছেন। একদিকে যেমন লেখকের নীরব প্রতিবাদ ও দলিত শ্রেণির মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে সমাজ সচেতনতার দিকটিও গল্পে যথেষ্ট সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

'অভাগীর স্বর্গ' (১৯২২) গল্পেও অভাগী নামের এক দলিত 'দুলে' জাতের মেয়ের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। কাঙালীর মায়ের ধর্ম বিশ্বাস কেন্দ্রিক মৃত্যু চিন্তার কথা ফুটে উঠেছে। মুখুজ্জে গিন্নির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখে তার মনে হয়েছে চিতার ধোঁয়ার মধ্যে যেন আকাশ থেকে রথ নেমে এসেছে, সেই রথে গিন্নিমা স্বর্গে গেছেন। তারও মনে সাধ ছেলের হাতের আগুন নিয়ে স্বর্গে যাওয়ার কিন্তু তার সাধ পূরণ করতে পারেনি কাঙালী, কেননা দুলে ছোট জাত অর্থাৎ দলিত শ্রেণি তাই সমাজে মরা পোড়ানোর তাদের অধিকার নেই।

ভট্টাচার্য মহাশয় বলে- "তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুরো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।"[১৫] সামন্তবাদী শোষণের অত্যাচারে নিজেদের জমিতে পোঁতা গাছ কাটতে গিয়ে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল। দলিত শ্রেণির সামাজিক সংকটকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। মানবতা বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে যেমন জেহাদ ঘোষণা করেছেন তেমনি দলিত শ্রেণির মানুষের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে মানবতার জয়গান গেয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের গল্পের আলোচনার পর আমরা তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও দলিত বর্গের কথা খুঁজে পেয়েছি, সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি- 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) উপন্যাসে দেখি কুঁয়াপুর গ্রামটি যদিও ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম হলেও দলিত জাতি হিসেবে কৈবর্ত, জেলে, সদগোপ, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। এছাড়া পিরপুরের মুসলমান লোকগুলি সমাজে অবহেলিত বা দলিত শ্রেণির ছোট জাত বলে চিহ্নিত। রমেশ দেখেছে "প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই এক ফোটা জমি-জায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দুদিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে।"[১৬] রমেশ উচ্চ পরিবারের সন্তান হয়েও জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাসী নয়, সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শ্রেণিশোষণ প্রজাদের দুর্দশার অন্যতম কারণ রমেশ বুঝতে পেরেছে তাই দলিত শ্রেণির প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য স্কুল বাড়ি নির্মাণ ও রাস্তাঘাট তৈরি সহ আরো নানান কাজে হাত লাগিয়েছে। এভাবেই লেখক দলিত শ্রেণির মানুষদের কথা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব: ১৯১৭ ও ২য় পর্ব: ১৯১৮) উপন্যাসের প্রথম পর্বে আমরা দলিত চরিত্র হিসেবে অন্নদাদিদি ও শাহজীকে পাই। শাহজী অন্যায় কর্মের জন্য পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং সেই সঙ্গে দলিত জাতির সাপুড়ের পেশা অবলম্বন করেছিল। উপায় অভাবে স্বেচ্ছায় সে দলিত বর্গে নিমজ্জিত হয়েছিল। অন্যদিকে অন্নদাদিদিও তার সতী ধর্ম বজায় রাখতে, নইলে স্বামীর প্রতি ভালবাসায় স্বেচ্ছাকৃতভাবেই স্বামীর সহগামিনী হয়েছিল। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে দেখি ঝি যখন ডোমের কথা বলে তখন লেখক জানাই- "ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুঁইয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি না, জানি না। কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি।"[১৭] এভাবেই লেখক সমাজের দলিত শ্রেণির মানুষদের দুঃখ দুর্দশা ও পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন।

'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) উপন্যাসটিতে জাতিগত বৈষম্য ও সংস্কারের চিত্রটি প্রকট হয়ে উঠেছে। এখানে প্রিয়নাথ এক অসহায় নিরাশ্রয় দলিত দুলে জাতির পরিবারকে গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার এক প্রান্তে আশ্রয় দেয়। তার জন্য প্রিয়নাথকে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। দলিত জাতিকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে রাসমণি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে ওঠে- "ও তুই এককড়ে দুলের মেয়ে বুঝি? তাই বল। এককড়ে মরতে না মরতে বুড়ো তোদের বের করে দিলে? ছোটজাতের মুখে আগুন! তা বাপু দিলে বলেই কি তোরা বামুনপাড়ায় এসে থাকবি? তোদের আস্পর্দা ত কম নয় লা! কে আনলে তোর মাকে? রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাই বুঝি? নইলে এমন বিদ্যে আর কার! ঘরজামায় ঘরজামাইয়ের মত থাক, তা না, শশুরের বিষয় পেয়েচিস বলে পাড়ার মধ্যে হাড়ি-ডোম-দুলে-ক্যাওরা এনে বসাবি।"[১৮] লেখক এভাবেই আমাদের দলিত বর্গের মানুষদের কিভাবে অত্যাচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করতে হয় তা দেখিয়েছেন।

'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) উপন্যাসে আমরা দলিত শ্রেণির পরিচয় পাই মতি চাঁড়ালের কথায়। যেখানে সে বলেছে- "ছোটজাত হয়ে জন্মেচি ঠাকুদ্দা, কিছুই ত জানি নে কি করতে হয়- একবার চল, বলিয়া সে দু'পা জড়াইয়া ধরিল।"[১৯] বিরাজ বৌ তুলসী চাঁড়ালের ঘর থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে যায়, তখন কোন অপমান তাকে তেমন করে বেঁধেনি। লেখক এখানে দেখিয়েছেন দলিত শ্রেণির মানুষের ঘর থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে যাচ্ছে বিরাজ, তাই এখানে কিছুটা হলেও দলিত শ্রেণির উত্থান লক্ষ্য করা গেছে।

'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) উপন্যাসে লেখকের বর্ণনায় আমরা দলিত শ্রেণির বসবাসের কথা পায়- "বলরামপুর সমৃদ্ধ গ্রাম। ছোট-বড় অনেকগুলি তালুকদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। একপ্রান্তে মুসলমান কৃষকপল্লী ও তাহারই অদূরে ঘর-কয়েক বাগদী ও দুলেদের বসতি।"[২০] অর্থাৎ এখানে দেখতে পাই গ্রামের দলিত শ্রেণির বসবাস গ্রামের এক প্রান্তে, যারা নীচ ও ছোট জাত বলে পরিচিত। তাই তাদের আলাদা করে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে।

'দেবদাস' (১৯১৭) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই চন্দ্রমুখি এসে অশত্থঝুরি গ্রামে ঘর বেঁধেছে এবং সেখানে দলিত শ্রেণির পরিচয় পায়- "এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই। চাষা, গোয়ালা, বাগদী, দু'ঘর কলু, আর গ্রামের শেষে ঘর দুই মুচীর বাস।"[২১] অর্থাৎ এখানেও আমরা ওই গ্রামে সমস্ত মানুষই দলিত বর্গের বলে জানতে পারি। তারা আপদে-বিপদে সবাই চন্দ্রমুখীর কাছে এসে টাকা নিয়ে যায়। তার পরিবর্তে তারা তাদের ক্ষেতের শাকসবজি, কলা, মূলা দিয়ে যায়। এখানে চন্দ্রমুখীর সঙ্গে দলিত জাতির নিবিড় সম্পর্কের ছবি ফুটে উঠেছে।

'দেনা-পাওনা' (১৯২৩) উপন্যাসে আমরা দলিত শ্রেণির পরিচয় পাই রায়মহাশয়ের আতঙ্ক প্রকাশের মধ্য দিয়ে- "তিনি জানিতেন ষোড়শীর কয়েকজন একান্ত অনুগত ভূমিজ ও বাগ্দী প্রজা আছে। তাহারা যেমন উদ্ধত তেমনি নিষ্ঠুর। ডাকাতি করে বলিয়া পুলিশের খাতায় নাম-ধাম পর্যন্ত লেখা আছে।"[২২] এভাবেই আমরা আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে কিছুটা হলেও দলিত বর্গের পরিচয় পাই।

পরিশেষে লেখকের কথা দিয়েই বলা যায়- "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুই নেই-এদের বেদনায় দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বীচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।"[২৩] শরৎচন্দ্র এভাবেই নিম্নবর্গের অন্ত্যজ দলিত শ্রেণির মানুষের দুঃখ বেদনার কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাদের উন্নতির ও মুক্তির কোনো পথ দেখান নি। আসলে তিনি আমাদের সমাজের পাঠক পাঠিকাদের কাছে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে থাকা দলিত মানুষের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্পণ করেছেন। শরৎচন্দ্র যদি এসব দলিত মানুষদের কথা সাহিত্যের পাতায় তুলে না ধরতেন তাহলে হয়তো তারা অতল জলেই পড়ে থাকতো। তাই বলা যায় শরৎচন্দ্রের লেখনিগুলো যেন সমাজের নিম্নবর্গীয় দলিত শ্রেণির মানুষের দলিল।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, সুধীর সম্পাদিত, ‘বুদ্ধিজীবীর নোটবই’, পুস্তক বিপণি, ২০০৫, পৃঃ ২১৬।
২. সেন, সুজিত, ‘দলিত আন্দোলন’, মিত্রম, ২০১৩, পৃঃ ১২০।
৩. তদেব, পৃঃ ১৬৪।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘রাশিয়ার চিঠি’, বিশ্বভারতী, ১৯৩১, পৃঃ ৫২।
৫. Dr. Ambedkar and Ahmedabad, An Echo Beyond the Heart. Yogendra Makwana, Sudarsan Agarwal(ed), India pvt. Ltd,1991, p.g 97.
৬. ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃঃ ৩৩।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, ‘বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃঃ ১৫।
৮. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’ (১ম খণ্ড), ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৯৩।
৯. সেন, ড. সুকুমার, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৪০, পৃঃ ১০।
১০. Monior Monior, Sir Williams. A Sanskrit-English Dictionary.
১১. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, ‘দলিত সাহিত্যের রূপরেখা’, বাণী শিল্প, ২০০৭, পৃঃ ২৯।
১২. রায়, গোপালচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় সং, ১৩৮২, পৃঃ ৮।
১৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, ‘শরৎ রচনাবলী’,(২য় খণ্ড)। দে’জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃঃ ৯৮৩।
১৪. তদেব, পৃঃ ১০১৮।
১৫. তদেব, পৃঃ ১০২৫।
১৬. তদেব, পৃঃ ২৭৮।
১৭. তদেব (১ম খণ্ড), পৃঃ ১৫৩।
১৮. তদেব (৩য় খণ্ড), পৃঃ ৫১৮।
১৯. তদেব (২য় খণ্ড), পৃঃ ৬৫৯।
২০. তদেব (৩য় খণ্ড), পৃঃ ২৫১।
২১. তদেব (১ম খণ্ড), পৃঃ ৭৪১।
২২. তদেব (৩য় খণ্ড), পৃঃ ৮০৬।
২৩. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, ‘শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার’, (৫৭তম জন্মদিনে প্রতিভাষণ), দে’জ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং, ২০১৬। পৃঃ ৩৩৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঘোষ, অজিতকুমার, ‘শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার’, দে’জ পাবলিশার্স, ২০১৬।
২. চক্রবর্তী, সুধীর সম্পাদিত, ‘বুদ্ধিজীবীর নোটবই’, পুস্তক বিপণি, ২০০৫।
৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, ‘শরৎ রচনাবলী’ (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দে’জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, ‘বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, ‘মঙ্গলকাব্যে : নিম্নবর্গের অবস্থান’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯।
৬. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, ‘দলিত সাহিত্যের রূপরেখা’ বাণীশিল্প, ২০২১।
৭. ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
৮. মুখোপাধ্যায়, অরুনকুমার, ‘শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার’, দে’জ পাবলিশার্স, ২০০১।
৯. মুখোপাধ্যায়, সুশোভন, ‘প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন’, করুণা প্রকাশনী, ১৪১৩।
১০. রায়, গোপালচন্দ্র, ‘শরৎচন্দ্র’, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।
১১. সেন, সুকুমার, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’(১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৪০।
১২. হোসেন, সোহারাব, ‘বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন’, করুণা প্রকাশনী, ২০০৪।